শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি কলিকাতা ১

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ

শ্রীঅনাথনাথ বসু

এম-এ (লণ্ডন), টিচার্স ডিপ্লোমা (লণ্ডন), টিচার্স সার্টিফিকেট
(উইনেট্‌কা, আমেরিকা)

অধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্দির, দিল্লী

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬০
তৃতীয় সংস্করণ
মাঘ, ১৩৬২
চতুর্থ সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৯

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক
সাধারণ প্রেস
১৫-এ, ক্ষুদিরাম বসু রোড
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট-মুদ্রণ
মোহন প্রেস
২, করিস্ চার্চ লেন
কলিকাতা ৯

বাঁধাই
মডার্ন বাইণ্ডার্স

দাম : ১·২৫

নিবেদন

দেশের লোক আজ ধীরে ধীরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতেছে। তাই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছে এবং দেশের সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু এ কথা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন যে আমাদের অভাবের তুলনায় কাজ অতি সামান্যই হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক কিছু করিবার আছে। এ সম্বন্ধে নানাভাবে পরীক্ষা করিবার স্থান ও প্রয়োজন রহিয়াছে।

গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে কি করিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন। গবর্নমেন্ট ছাড়াও গত দুইটি জাতীয় আন্দোলনের সময় দেশের যুবককর্মীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। তাহাদের চেষ্টা ভাল কি মন্দ, তাহা সফল হইয়াছে কি ব্যর্থ হইয়াছে, সে আলোচনা করিবার প্রয়োজন আজ নাই; কিন্তু আজও যে তাহাদের মধ্যে একদল প্রাথমিক শিক্ষার ভিতর দিয়া দেশের সেবা করিতে চাহে ইহার পরিচয় নানাভাবে পাওয়া যাইতেছে।

কয়েকজন বন্ধুর আগ্রহে ও পরামর্শে বিশেষ করিয়া তাঁহাদেরই জন্য প্রাথমিক শিক্ষার এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা তাঁহাদের ও প্রাথমিক শিক্ষায় ব্রতী অন্যান্য কর্মীদের যদি বিন্দুমাত্র সাহায্য হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইবে।

কলিকাতা
১লা আষাঢ়, ১৩৪১। **শ্রীঅনাথনাথ বসু**

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে লেখা এই প্রবন্ধটি এখন আর নূতন করিয়া ছাপা চলে কিনা এ বিষয়ে মনে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। কিন্তু বন্ধুগণ মনে করেন, এ দ্বিধার কারণ নাই, আজও এই প্রবন্ধের আবেদন ঠিকই আছে। ইতিমধ্যে গান্ধীজীর 'নঈ তালিম'-এর আন্দোলন আসিয়াছে। এ দেশের ইতিহাসে যুগপরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, আমরা স্বাধীন হইয়াছি। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি যেখানে এদেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ 'মানুষ' হইতেছে সেগুলি যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গিয়াছে। বহু বাগাড়ম্বর, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেখানকার শিক্ষাধারার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। যদি এই প্রবন্ধটি আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্যে কয়েকজনকেও চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া নূতন পথে চলিতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

মূল প্রবন্ধে কোন পরিবর্তন ইচ্ছা করিয়াই করি নাই; কারণ, করিতে গেলে নূতন করিয়া একটা বই লিখিতে হইত এবং প্রবন্ধটি হইত তাহার ভূমিকামাত্র। আপাতত নানাকারণে মুখবন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল।

দিল্লী

১লা আশ্বিন, ১৩৬০ সাল।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রাথমিক শিক্ষার আদর্শ

প্রাথমিক শিক্ষা লইয়া নানাভাবের আলোচনা আমাদের দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া হইয়াছে। দেশের নানাস্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং হইতেছে। সুতরাং ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি কয়েকটা বিষয়ে নূতন করিয়া আলোচনা না করিলেও চলিতে পারে। তবে ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হইবে; কারণ উদ্দেশ্যভেদে প্রাথমিক শিক্ষায়তনগুলির রূপের ও প্রকৃতির পার্থক্য ঘটিবে।

সরকারী এবং বেসরকারী অনেক জায়গাতেই বলা হইয়াছে, প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য literacy দান অর্থাৎ বর্ণপরিচয় বিধান। উদাহরণ স্বরূপ এখানে দুইটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সাইমন কমিশনের অক্সিলিয়ারী কমিটির রিপোর্ট-এ বলা হইয়াছে—

"While in a primary school in India, little can be attempted at present beyond instruction in reading, writing and elementary Arithmetic and while the need for literacy is so great that

for sometime "three R's and no nonsense" must be the motto of the schools it is essential that the instruction should be related in early stages to matters which the village child sees and knows and understands." (p. 78)

অর্থাৎ কিনা, গ্রামের ছেলেমেয়েদের তাহাদের মত করিয়া লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন হইলেও বর্তমানে বর্ণপরিচয় বিধানের প্রয়োজন এত বেশী যে, লেখা পড়া ও অঙ্ক (three R's) ছাড়া আর কিছু শিখাইবার দিকে দৃষ্টি দিলে চলিবে না। সম্প্রতি বোম্বাই ম্যুনিসিপ্যালিটির স্কুল-কমিটির অধ্যক্ষ মিঃ পারুলেকর Mass Education in India নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Simplification of the curriculum means concentrating on the three R's and giving up all other subjects such as grammar, history, geography, object lessons, drawing, nature study etc. * * we want to concentrate on essentials only in our primary schools leaving the nonessentials to the future or to privately managed institutions. This is the supreme need of the time and the necessary action to reduce the curriculum to the minimum must be courageously and immediately taken. (pp. 12-13).

অর্থাৎ, আর সকল কিছু ছাড়িয়া three R's—লেখা, পড়া ও অঙ্কের উপর জোর দিতে হইবে।

সাধারণতঃ যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সহিত আমাদের পরিচয় আছে তাহাদের পিছনে প্রাথমিক শিক্ষার এই নীতি রহিয়াছে। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সমালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহার ফলে আজকালকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কি রূপ হইয়াছে, তাহাদের ব্যর্থতা কতখানি সুপরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যেখানে শিশু ও বালক-বালিকাগণ সানন্দে জীবনপথে চলিবার শিক্ষালাভ করিবে সেখানে তাহা না করিয়া তাহাদিগকে শুষ্ক বিদ্যার ও জীর্ণ পুঁথির ভারে ভারাক্রান্ত করা হইতেছে। সেখানে বর্ণপরিচয় হইতেছে বটে, কিন্তু সে পরিচয় আনন্দরসে জীর্ণ না হওয়ায় তাহা জীবনে কার্যকর হইয়া উঠিতেছে না। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই সে পরিচয় যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। যাহার সহিত পরিচয়ে আনন্দ লাভ করি, তাহাকে আমি ভুলিতে পারি না; কিন্তু যাহার সহিত পরিচয় করিতে দুঃখ, শাস্তি ও বেত্রপ্রহার ছাড়া আর কিছু মেলে না তাহাকে ভুলিতে মন দ্বিধা বোধ করে না। সকলেই জানেন, প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত একটা খুব বড় সমস্যা লেখাপড়া ছাড়িবার কিছুদিন পরেই লেখাপড়া ভুলিয়া যাওয়া (relapse into illiteracy)।

আর একটা কথা। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে শুধু লেখা, পড়া ও অঙ্ক শেখানই প্রাথমিক শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা হইলেও প্রশ্ন হয় যে তাহা শিখাইতে কত সময় লাগে? যখন পূরা তিন বৎসর ধরিয়া শিশুরা এই বিষয়গুলিই শিখিয়া কাটায় এবং কিছুদিন পরেই তাহাদের ব্যবহার ভুলিয়া যায়, তখন বুঝিতে হইবে গলদ শিশুদের মধ্যে নয়, অন্যত্র। আমরা সকলেই জানি, এক শ্রেণীর উপকারী খাদ্য আছে যেগুলি সদ্য সদ্য গ্রহণ করা যায় না, অন্য খাদ্যের সহিত মিশাইয়া লইয়াই তবে সেগুলিকে শরীরপোষণের কার্যে লাগান যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। অবশ্য আমি প্রাথমিক শিক্ষার এই সঙ্কীর্ণ আদর্শ স্বীকার করি না। তাহা ছাড়া, এ কথাও স্বীকার করা চলে না যে, তিন বৎসরের যে পাঠ্যতালিকা গৃহীত হইয়াছে, তদনুযায়ী কার্য শেষ করিতে তিন বৎসর লাগে। আমার বিশ্বাস, অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে বর্ণপরিচয় ও পাটীগণিতের মূলসূত্রগুলির সহিত পরিচয় সাধন ছাড়াও অন্য অনেক কিছু অবশ্য-জ্ঞাতব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিশুকে শেখান যাইতে পারে।

এ কথা আজ বলা প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে যে, বিদ্যাদান শিক্ষায়তনের একমাত্র মূল উদ্দেশ্য নহে, বরং সেটাকে অন্য একটি কিছুর by-product বা গৌণফল স্বরূপ মনে করিলে বিদ্যাদান ও লাভ ব্যাপারটি সহজ হয় এবং লব্ধ বিদ্যা জীবনযাত্রার পক্ষে কার্যকরী হইয়া উঠে।

নিছক বিদ্যালাভ আমাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কিরূপে বিদ্যাকে কার্যকরী করিতে পারা যায়, তাহাকে ব্যবহারিক করিয়া তোলা যায়, কিরূপে 'আচার'কে সংস্কার করা যায় তাহাই সমস্যা। বিদ্যা সাধন মাত্র, সাধ্য নহে। সুতরাং 'আচার'কে জীবনের প্রাথমিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সেই 'আচার'কে সংস্কৃত, সুন্দর ও সংহত করিবার জন্যই জ্ঞানের প্রয়োজন। কথাটা পুরাতন, অতি পুরাতন। আমাদের দেশেই একদিন শিক্ষকগণ আচার্য নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু আজ আমরা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি; তাই ইহার পুনরুক্তি করিতে হইল।

বিদ্যাকে বড় করিলে 'আচার'কে ছোট করিতে হয় অথচ বিদ্যা তো উপলক্ষ্য মাত্র, 'আচার'ই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়েও 'আচার'কে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষায়তন গড়িয়া তুলিতে হইবে; বিদ্যালাভ বা বর্ণপরিচয় সত্য 'আচার'—গঠনের সহায়কমাত্র হইবে। ঠিকভাবে জীবন যাপন করিতে হইলে কতকগুলি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হয়; সেই জ্ঞানলাভ করিবার জন্যই বিদ্যার প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়িয়া গেল, মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আজ চারিদিকে যে সমালোচনা উঠিয়াছে, তাহার মর্ম কতকটা এই যে, এই শিক্ষা জীবনের উপর কোন প্রভাব আনিতে পারে নাই, সুতরাং ইহা ব্যর্থ হইয়াছে। সমালোচকগণ বলিতেছেন, বিদ্যার্জন হইতেছে বটে কিন্তু 'আচার' নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না।

তাঁহাদের মতে ইহার প্রতিকারস্বরূপ বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবন (corporate life) গড়িয়া তুলিতে হইবে।

যদি মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাই সত্য হয় যে, বিদ্যা ও জ্ঞানের চেয়ে 'আচার' বড়, তবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই সত্য কেন সত্য নয় তাহা বোঝা কঠিন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যর্থতার কারণও এই একই। সেখানে আমার three R-কেই বড় করিয়া দেখিয়াছি, জীবনকে নহে।

আমি যে অর্থে 'আচার' শব্দটি ব্যবহার করিতেছি তাহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 'আচার' শব্দটির সাধারণ যে সংজ্ঞা আমাদের ভাষায় গৃহীত হইয়াছে সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমি শব্দটির ব্যবহার করি নাই। ইংরেজীতে যাহাকে conduct বলে সেই অর্থেই আমি শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি। ইহার পরিবর্তে জীবনের ছন্দ বা চলিবার ভঙ্গী শব্দগুলিও প্রয়োগ করা যাইতে পারিত। শিক্ষার উদ্দেশ্য এই আচার গঠন, সংস্কার ও নিয়ন্ত্রণ। 'চরিত্রগঠন' বলিতেও কতকটা ইহাই বুঝায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চরিত্রগঠন বলিলেই আমরা শাসন বুঝি; তাহার মধ্যে শাসনের ভাব অত্যন্ত সুপরিস্ফুট। আমরা যে শিক্ষাবিধির পরিকল্পনা করিতেছি তাহার মধ্যে শাসন, বাহ্যশাসনের স্থান নাই। আচার শাসন করিয়া হয় না, শাসনের দ্বারা যে আচারের সৃষ্টি তাহা মিথ্যাচার। মূলতঃ শাসন বা discipline ভিতরের, অন্তরের ব্যাপার; তাহাকে বাহিরের ব্যাপারে পরিণত করিয়াই

আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে সকল গোলমাল বাধাইয়াছি। তাহার ফলে আমাদের সমূহ ক্ষতিই হইয়াছে, জ্ঞান ও জীবনের মধ্যে গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছে। ধর্ম ও কর্মের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছে।

যদি এমন ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়, যেখানে ছেলেমেয়েরা আপনা হইতেই জীবনে চলিবার ছন্দ আয়ত্ত করিতে পারিবে, আচার গঠন করিয়া তুলিতে পারিবে, নিজেকে সংযত ও শাসন করিতে শিখিবে এবং সে শেখার মধ্যে আনন্দ লাভ করিবে, তবেই সত্য আচার গঠিত হইয়া উঠিবে, জ্ঞান ও জীবনের একটা সমন্বয় ঘটিবে এবং বিদ্যা সার্থক হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন অনুকূল আবেষ্টনের। সেই আবেষ্টনে থাকার ফলে শিশু প্রথমতঃ জীবন-গঠনে সহায়তা লাভ করিবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ করিয়া ভাবীকালের জীবনযাত্রার পাথেয় ও উৎসাহ সংগ্রহ করিবে। মোটের উপর বিদ্যালয়কে বিদ্যাদানের ও বিদ্যালাভের কেন্দ্ররূপে না ভাবিয়া যদি আমরা তাহাকে শিশুর দেহ ও মনের বিকাশের অনুকূল একটি আবেষ্টনরূপে কল্পনা করি, তবেই বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

সুতরাং আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সর্বপ্রধান লক্ষ্য হইবে কি করিয়া শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অনুকূল একটি আবহাওয়া সেখানে সৃষ্টি করিতে পারা যায়। তাহার পর দেখিতে হইবে শিশুচিত্তকে আকর্ষণ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই আবেষ্টনের আছে কিনা।

সকল পিতামাতাই জানেন, জোর করিয়া খাওয়াইলে সে অন্ন শিশুকে পুষ্টিদান করে না। অথচ বিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা করিয়াছি। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে এমন কোন আয়োজন তো থাকেই না যাহাতে শিশু আনন্দ বোধ করে, বরং এমন নানা ব্যবস্থা থাকে যাহার ফলে শিশু কখন বিদ্যালয়ের ছুটি হইবে তাহারই জন্য উন্মুখ হইয়া থাকে। অবশ্য অনুকূল ব্যবস্থা করিলেই যে সকল সময়ে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এমন নহে। আমরা পুষ্টিকর আহার্যের আয়োজন করিতে পারি, কিন্তু সে আয়োজন ব্যর্থ হইবে যদি শিশু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মে সানন্দ সহযোগিতা না করে। শিক্ষাতত্ত্বের প্রাথমিক সত্য শিশুর চিত্তে আগ্রহ ও উৎসাহ সম্পাদন। এ কথাটা ভুলিলে শিক্ষাদান ব্যাপারটা বোঝা হইয়া ওঠে, শিক্ষালাভও ততোধিক বোঝা হইয়া দাঁড়ায়।

এইখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ্য নূতন সমাজ গঠন। আমাদের এই ভাবী সমাজ সকলের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট হইবে। ইহার মূল কথা সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নহে। আমরা আজ যে সামাজিক আবহাওয়ায় বাস করিতেছি সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নীতিরূপে গৃহীত হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজতাত্ত্বিক ও জীববৈজ্ঞানিকগণ এই নীতিকেই জীবনের একমাত্র নীতি বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইহা একদিন কার্যকরী হইয়া উঠিয়াছিল; তাই অন্যত্র, এমন কি শিক্ষাক্ষেত্রেও, এই নীতি অনুসৃত হইয়াছিল। তাহারই

ফল তিরস্কার ও পুরস্কারের আয়োজন। বৎসরের শেষে পুরস্কার-বিতরণ সভার ভিড় লাগিয়া যায়। তাহার উপর আবার বৃত্তি-পরীক্ষা আছে।

এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতানীতি কিছু ফল দেয়, কিন্তু সেটা যখন উগ্র হইয়া দেখা দেয় তখন সমাজের অকল্যাণ ঘটে। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনীতির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহার পরিণতিও তাহাই। এককালে ব্যষ্টিও সমষ্টিকে আমরা পরস্পরবিরোধী বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং উনবিংশ শতকে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকেই সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে চরম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলাম। পাশ্চাত্ত্য জীবনে তাহার উগ্র প্রকাশের ফলে আমরা সেখানকার সমাজের যে রূপ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হইতেছে কথাটা আমাদের ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। আমেরিকার সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিতে আজ social planning-এর কথা শোনা যাইতেছে; কার্যতঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও সেই ব্যাপার চলিয়াছে।

কিন্তু আমাদের মোহ এখনও কাটে নাই।

ভারতবর্ষের সম্মুখে আজ সকলের চেয়ে গুরুতর সমস্যা এই ভাবী সমাজ গঠন। তাহার শিক্ষা পত্তন করিতে হইবে প্রাথমিক বিদ্যালয়-গৃহেই।

বিদ্যালয় একটি সমাজ, বাহিরের বৃহত্তর সমাজের ক্ষুদ্রতর সংস্কৃত সংস্করণ বা প্রতিচ্ছায়া। শিক্ষাতত্ত্বের এই প্রাথমিক সত্যকে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাদানে ব্যাপৃত কর্মীদের প্রতি

মুহূর্তে স্মরণ করিতে হইবে। শিশু যদি সহজে সেই বিদ্যালয়-সমাজের নাগরিকতার অধিকার গ্রহণ করিতে শেখে, তবে বৃহত্তর সমাজে প্রবেশ করিয়া সে সহজেই আপনার স্থান করিয়া লইতে পারিবে। যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া সকলের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারে, তবে তাহার মনে যে সামাজিকতাবোধ জাগ্রত হইবে তাহাই ভবিষ্যতে একদিন ভাবী সমাজ গঠনে আমাদের সহায় হইবে। সুতরাং লেখাপড়ায়, খেলাধূলায় এবং বিশেষ করিয়া সকলপ্রকার আনুষ্ঠানিক কর্মে এই সহযোগিতানীতির প্রবর্তন করিতে হইবে। কি করিয়া বিদ্যাশিক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া চলে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যদি শিক্ষালাভের আনন্দই যথেষ্ট উৎসাহ না দিতে পারে এবং সেইজন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তেজনার সহায়তা লইতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে শিক্ষাদানে কোথাও একটা গলদ রহিয়া গিয়াছে।

বিদ্যালয়কে সমাজরূপে দেখিলে বুঝিতে পারিব, ইহাতে বিদ্যাদান অন্যান্য আবশ্যক কর্মের অন্যতম। সমাজ বিচিত্র ক্রিয়ার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া যে মণ্ডলী গঠিত হয় তাহার সহিত সমাজের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সমাজ মানুষের অন্তরস্থিত বৈচিত্র্যের বিকাশক্ষেত্র; সেখানে মানুষ শুধু বিশেষ একটি কর্তব্য লইয়াই দিন কাটায় না; কর্তব্যে, উৎসবে, স্নেহশ্রদ্ধার প্রকাশে মানুষ সেখানে আপনার

বিকাশ খুঁজিতেছে। সেখানে যেমন কর্তব্য সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্র রহিয়াছে তেমনি কর্তব্যাতীত আনন্দ-উৎসবের আয়োজনের স্থান আছে।

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিশুকে তেমনিভাবে আপনার মনের সর্ববিধ বিকাশের স্থান করিয়া দিতে হইবে। সেখানে যেমন লেখাপড়ার আয়োজন থাকিবে তেমনি খেলাধূলার ব্যবস্থা ও উৎসবের আয়োজন থাকিবে। এগুলি একান্ত প্রয়োজন।

যে সামাজিকতাবোধ জাগ্রত করা আমাদের বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি তাহার বিকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য আরও কয়েকটি ব্যবস্থা আমাদের করিতে হইবে। পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনে শিশুদের কর্তব্যগুলি নির্দেশ করিলেই চলিবে না; সে কর্তব্য হাতে-কলমে কিভাবে নিষ্পন্ন করা যায় তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। সমাজে, বিশেষ করিয়া পল্লীসমাজে, এমন কতকগুলি কাজ আছে যাহা শিশুরা অনায়াসে করিতে পারে। পথঘাটগুলি পরিষ্কার রাখা, নূতন পথ তৈয়ারি করা, মাঝে মাঝে পানা পরিষ্কার করা, সকলের ফসল গরু-ছাগলের হাত হইতে রক্ষা করা, ছায়াদানের জন্য বৃক্ষরোপণ করা, পল্লীশ্রীবর্ধনের জন্য ফুলের বাগান করা, এরূপ অনেক কাজ আছে যেগুলি শিক্ষকগণের সহায়তায় ও সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীগণ করিতে পারে। এইরূপ কাজ করিবার সময়ে কর্তব্য ও সমাজের প্রতি দায়িত্বের উপর যেমন জোর দিতে হইবে তেমনি তাহার

মধ্যে যে স্বাভাবিক আনন্দ আছে তাহাও বুঝাইয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, তাড়না বা পুরস্কারের অপেক্ষা না রাখিয়াই শিশুর অলক্ষ্যে শিশু যেন ধীরে ধীরে এই শিক্ষা লাভ করে।

বিদ্যালয়-সমাজ ও বৃহত্তর সমাজ উভয়ের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে হইবে। সামাজিকতাবোধের ক্রমবিকাশে শিশু প্রথমে বিদ্যালয়-সমাজের কর্তব্যে দীক্ষা লাভ করিয়া পরে ধীরে ধীরে বৃহত্তর সমাজের কর্তব্যে দীক্ষাগ্রহণ করিবে।

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে। সাধারণতঃ এই বিদ্যালয়গুলিতে পল্লীগ্রামের দরিদ্র, বঞ্চিত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীগণই আসিবে। তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায় আপনার ব্যবস্থা আপনিই করিতে পারে; সুতরাং তাহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আয়োজন করিবার প্রয়োজন আমাদের নাই। অবশ্য, ক্ষেত্রবিশেষে সেরূপ সম্প্রদায়ের শিশুগণও আমাদের এই বিদ্যালয়ে যোগদান করিবে, কিন্তু মূলতঃ আমাদের কার্য হইবে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের শিশুদের লইয়াই।

এ কথা স্মরণ রাখিলে বিদ্যালয়ের কতকগুলি কর্তব্য আমাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যালয়কে একটি সমাজে পরিণত করিতে হইবে এবং তাহাতে এমন একটি আবেষ্টন, আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে শিশুগণ আপনা হইতে বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সত্য আচার পালন করিতে শিখিবে। আচার সম্বন্ধে একথাও বলিয়াছি যে, সে আচার শিশু নিজের আনন্দে শিক্ষা করিবে। সুতরাং তাহাকে

আচার পালন না বলিয়া আচার গ্রহণ বলিলেই ঠিক বলা হয়। সমাজের যে স্তর হইতে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ আসিবে সে স্তরে কতকগুলি আচার শিক্ষা করিবার কোন আয়োজনই অভিভাবকগণের দারিদ্র্য, দায়িত্ববোধের অভাব ও অজ্ঞতাবশতঃ নাই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা, প্রত্যহ স্নান করা, দাঁত মাজা প্রভৃতি বাহ্য আচার শিশুকে শিখিতে হইবে। সত্য কথা বলা, সময়ানুবর্তন করিয়া চলা, প্রতিশ্রুতি পালন করা প্রভৃতি কতকগুলি একান্ত আবশ্যক মানসিক আচারও তাহাদের শেখা প্রয়োজন। এগুলির কোনটাই তো বই পড়িয়া হয় না, স্নুতরাং বিদ্যালয়ের সমাজে সেগুলি শিখিবার অনুকূল ক্ষেত্র গঠন করিয়া তুলিতে হইবে। এইখানে বিদ্যালয়কে কিছু পরিমাণে গৃহের ও পরিবারের কর্তব্য ও স্থান গ্রহণ করিতে হইবে। অবশ্য আদর্শ ব্যবস্থা যেখানে, সেখানে পরিবারও বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানে সহযোগিতা করে। আমাদের সমাজের বর্তমান অবস্থায় আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এই সহযোগিতা আশা করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে একদিন আমরা এই সহযোগিতা লাভ করিতে পারি। এই প্রবন্ধের শেষে যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করিয়া বয়ঃশিক্ষার আয়োজনের কথা বলিব তখন এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

এতক্ষণ আমি বিদ্যালয়ের সহযোগিতার কথাই বলিয়াছি। ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমাদের বিদ্যালয়ে

ব্যক্তিত্বের বিকাশের সুযোগ দেওয়া হইবে না। আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে কোনমতেই খর্ব করিতে চাহি না। বরং কিভাবে শিশু তাহার নিজের গতিতে নিজের ছন্দে জীবনে চলিতে পারে সেই শিক্ষা দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। উহার জন্য সকলপ্রকার আয়োজন আমাদের করিতে হইবে। এ কথা আমরা যেন মনে রাখি যে, যে ভাবী সমাজ আমরা গঠন করিতে চাহিতেছি তাহার প্রত্যেক লোকটিকেই স্বাধীন, চিন্তাশীল, স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে হইবে। যে চিরদিন পরের কথা শুনিয়া চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে সে স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। ভাবী সমাজের একটি কাল্পনিক আদর্শ মনে করিয়া তাহারই ছাঁচে সকলকে গড়িয়া তোলা মোটেই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এমন কি, আজ যদি ভবিষ্যতের সমাজ ঠিক কি আকার ধারণ করিবে তাহা বলিতে যাই তবে স্পর্ধা ছাড়া আর কিছুই হইবে না। সমাজ চিরদিনই পরিবর্তনশীল, ভাবী সমাজও ঠিক একস্থানে স্থির হইয়া থাকিবে না। মানুষের সবচেয়ে কঠিন কাজ এই পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া চলা। এই চলার জন্য প্রয়োজন জাগ্রত বলিষ্ঠ চলিষ্ণু মন, স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি। বাহিরের বিধিনিষেধের দ্বারা যে মানুষ নিয়ত শাসিত হইতেছে তাহার পক্ষে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। ভুল করিতে করিতেই মানুষ শেখে। ভুল করিতে যে মানুষ ভয় পায়, বুঝিতে হইবে তাহার মনে জড়তা আসিয়াছে। অবশ্য যাহারা সুখের চেয়ে স্বস্তিকে বড় বলিয়া মনে করে, তাহারা ভুল করিতে, জীবন লইয়া পরীক্ষা করিতে ভয় পায়।

কিন্তু সেই প্রকৃতির লোককে লইয়া আমরা ভাবী সমাজ গড়িতে চাই না। সুতরাং শিশুকে পদে পদে বিধিনিষেধের নাগপাশে আমরা বাঁধিব না। আর একটি কথা। কি করিয়া বলিব যে, বিশ বৎসর পরে সমাজে এই গুণগুলির প্রয়োজন হইবে, সুতরাং আজ হইতে তাহাদেরই অনুশীলন করিতে হইবে? সেদিন কিভাবে একটা বিশেষ অবস্থায় বিশেষভাবে চলিতে হইবে তাহার বিচার আমি আজ কি করিয়া করিতে পারি? তাহা যে করিবে সেই শিশুকে যদি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইতে পারি তবেই আমরা আমাদের কর্তব্য করিলাম।

শিশুকে এই স্বাধীনতা দান উচ্ছৃঙ্খলতার অনুমোদন নহে। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সমানার্থবোধক নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষ্যহীন কিন্তু স্বাধীনতা তাহা নহে। উচ্ছৃঙ্খলতার পরিসমাপ্তি তাহার নিজেরই মধ্যে; কিন্তু স্বাধীনতা বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্যই প্রয়োজন। স্বাধীনতার ভিতর সংযমের ভাব নিহিত রহিয়াছে। শিশু অপরিণত, সুতরাং কিছুটা বিধিনিষেধ থাকিবেই। কিন্তু সেগুলির অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা যেন সে বোঝে। সেগুলির সংখ্যা যতদূর সম্ভব কম করা দরকার এবং নূতন বিধিনিষেধের সৃষ্টিতে তাহার সহয়োগিতা প্রয়োজন। আমাদের বিদ্যালয়ে অতি অল্পসংখ্যক বিধিনিষেধ থাকিবে; আর এমন করিয়া আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে যে নূতন বিধিনিষেধসৃষ্টির তাগিদ শিক্ষার্থীর ভিতর হইতেই প্রথম আসিবে।

শিশুর স্বাধীনতাপ্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। উপস্থিত যে ভাবের শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলিয়াছে তাহাতে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ, তাহাতে মানুষের স্বভাবের বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া শিক্ষার্থীগণকে সমগ্র অর্থাৎ মণ্ডলী হিসাবে—ব্যষ্টি হিসাবে নয়, সমষ্টি হিসাবে—দেখা হয়। দ্বিতীয়তঃ, সেখানে শিক্ষার্থীর চেয়ে, পাঠ্যকে, শিক্ষণীয় বিষয়কে বড় করিয়া গ্রহণ করা হয়।

মানুষ বিচিত্র, একজনের সহিত অপরের সম্পূর্ণ মিল নাই, এবং যেখানে মিল নাই সেখানেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিলে জীবনের স্বাভাবিক ধর্মকে অস্বীকার করা হয়। অবশ্য নানাস্থানে সমষ্টিকে লইয়াই হিসাব করিতে হয়। কিন্তু অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যষ্টির বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করিলে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়।

আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা একটি শিশুকে দশটির মধ্যে একটি রূপে দেখিব না; আমরা তাহাকে এককরূপে, প্রাণ-শক্তির একটি অখণ্ড বিশিষ্ট প্রকাশরূপে দেখিব। তাহার মধ্যে যেটুকু সুন্দর, কল্যাণকর তাহার রক্ষা ও বিকাশের চেষ্টা করিব। এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের শিক্ষাকে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় পরিণত করিতে হইবে।

সুতরাং শিশুর অন্তর্নিহিত বৈচিত্র্যের পরিপুষ্টি ও বিকাশের জন্য আমাদের আয়োজনও পরিপূর্ণ ও বিচিত্র করিতে হইবে। হয়তো সকল শিশুরই বর্ণপরিচয় হইবে কিন্তু তাহার মধ্যে একজন

হয়তো এই সঙ্গে সঙ্গীত বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তির অধিকারী। তাহার জন্য যদি সঙ্গীতশিক্ষার আয়োজন না করি তবে তাহার প্রতি অবিচার করা হইবে এবং পরোক্ষভাবে সমাজের প্রতিও অবিচার করা হইবে। হয়তো এই শিশু সঙ্গীতের সাহায্যেই ভাবী সমাজের সেবা করিতে পারে।

অবশ্য আমি জানি যে, সকল প্রকারের আয়োজন করা আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যে কুলাইবে না; কিন্তু আমাদের এই নীতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব আয়োজন করিতে হইবে।

আমি জানি, শিশুকে সমষ্টির অন্যতম, অন্য সকল শিশুর সঙ্গে সর্ববিষয়ে সমান ভাবিতে পারিলে শিক্ষাদান সহজ হইয়া পড়ে এবং দায়িত্বও কমিয়া যায়। তাহার বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী শিক্ষার আয়োজন করা কষ্টসাধ্য ও সেরূপ ভাবে শিক্ষাদান করার দায়িত্ব অনেকখানি। কিন্তু আমাদের সে দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আজ যে আমাদের জাতীয় জীবন বৈচিত্র্যহীন হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীই যে এক ছাঁচে ঢালা যন্ত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার জন্য বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী যে কত পরিমাণে দায়ী, তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বর্তমানে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের চেয়ে পাঠ্যবিষয়কে বড় করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহার কারণ আমরা পরিণতবয়স্কের দৃষ্টি লইয়াই শিক্ষাপ্রণালীর বিধান

করিয়াছি। পরিণত বয়সে শিশুর কি কি বিষয়ে জ্ঞান কাজে লাগিতে পারে তাহাই ধরিয়া লইয়া আমরা কতকগুলি বিষয় ঠিক করিয়া দিয়াছি। খাদ্যের বেলায় আমরা শিশুকে পরিণত-বয়স্কদের দৃষ্টি লইয়া বিচার করি না, তাহার প্রয়োজন বিচার করিয়া চলি। অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা আমরা করিয়াছি।

অবশ্য বর্ণপরিচয় ও যোগবিয়োগ গুণভাগের সহিত পরিচয় অল্পাধিক পরিমাণে সকল শিশুরই জ্ঞাতব্য বিষয়। কিন্তু তাহাদের চেয়েও প্রাথমিক জ্ঞাতব্য বিষয় আরও অনেক আছে, যেগুলি হয়তো শিশুচিত্তের পক্ষে অধিকতর পরিমাণে গ্রহণযোগ্য, অথচ বর্তমান পাঠ্যসূচীতে তাহাদের স্থান নাই। না হয় পাঠ্যসূচীর সংস্কার করিয়া তাহাদেরও স্থান করা গেল, কিন্তু তাহা হইলেও সমস্যার সমাধান হয় না।

সমস্যা এই যে, আমরা শিশুর চেয়ে শিশুর পাঠ্যের প্রতি বেশী নজর দিই। সুতরাং পাঠ্য শেষ করার দিকে ঝোঁক বেশী পড়ে এবং শিশুর মনের বিকাশ ঠিকমত হইতেছে কি না সেদিকে দৃষ্টি দিবার অবকাশ থাকে না। আর পাঠ্যের প্রতি বেশী নজর দিলে ফল হয় এই যে, অস্বাভাবিক উপায়ে তাহা শেষ করিবার লোভ আসে। সেইজন্যই তিরস্কার ও পুরস্কারের আয়োজন করিতে হয়।

যদি আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন করিতে পারি তবেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

আমাদের বর্তমান জাতীয় জীবনের দৈন্যের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া অনেকে আমাদের চিন্তাশক্তির জড়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি অভাব অনেকেরই দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। চলিষ্ণু মানবচিত্ত স্বভাবতই সৃজনশীল ; সৃষ্টি করিবার, নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার আগ্রহ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। নানা কারণে আমাদের বর্তমান সমাজে সেই বৃত্তির বিকাশের আয়োজন অতি সামান্যই আছে। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে তাহার আয়োজন আরও কম আছে, কারণ এখনও সেখানে আমরা ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি নাই। সম্প্রতি এবিষয়ে যে সামান্য দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহার প্রমাণ পাই পাঠ্যসূচীতে "হস্তসম্পাদ্য" কার্যের তালিকায়। কিন্তু সেটা কতকটা বেগারঠেলা ভাবে স্বীকার করা। যেহেতু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাতাত্ত্বিকগণ ইহার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের অনুকরণে কিছু ব্যবস্থা করিতে হইবে, নতুবা লোকে কি বলিবে ? ভাবটা কতকটা এমনই।

অথচ যে ভাবী সমাজের কল্পনা আমরা করিয়া থাকি তাহার নাগরিকগণের সবচেয়ে বড় কাজ হইবে নূতন করিয়া সমাজ ও জীবন গঠন, নূতন সমাজ সৃষ্টি। যে সৃষ্টি করিতে শিখিল না, যে কোনদিনই সৃজনের আনন্দ আস্বাদ করিল না এবং যাহাকে চিরদিনই পরের অনুকরণ করিয়া চলিতে হইল, সে কেমন করিয়া নূতন সমাজ সৃষ্টি করিবে ? তাহার অন্তরে এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিবার কোন্ প্রেরণা আছে ?

আমাদের বিদ্যালয়ে শিশুচিত্তের সেই স্বাভাবিক বৃত্তির বিকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছোট সৃষ্টি করিতে করিতেই মানুষ বড় সৃষ্টি করিতে শেখে। যে শিশু একটি বীজ হইতে ফুলগাছ তৈয়ারি করিতে শিখিল তাহার শিক্ষা তুচ্ছ নহে। সৃষ্টি করার চেষ্টায় সেইটুকুই প্রথম ধাপ হইতে পারে এবং তাহাকেই অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে শিশু অনেক কিছু শিখিতে পারে।

আর একটি বিশেষ কারণে শিশুকে সৃষ্টি করিবার আনন্দের স্বাদ দিতে হইবে। মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির অন্যতম বৃত্তি হইতেছে সংগ্রহ করিবার, সঞ্চয় করিবার বৃত্তি (acquisitive instinct)। ইহারই তাড়নায় মানুষ নিজেকে বঞ্চিত করিয়া, পরকে বঞ্চিত করিয়া যক্ষের মত অর্থহীন সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ হয়। আমাদের সমাজের বহু দুঃখের মূলেই এই বৃত্তির ক্রিয়া রহিয়াছে। অবশ্য এই বৃত্তির সকলটুকুই খারাপ নহে। সারাজীবন নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অর্থসঞ্চয় করিয়া যে লোক মরণকালে ভাবীকালের কল্যাণের জন্য সে অর্থ দান করিয়া গেল, সে মহাপুরুষ। কিন্তু আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই সেভাবে সঞ্চয় করে না। যাই হ'ক, সমাজরক্ষার জন্য এই বৃত্তির সংযত বিকাশের প্রয়োজন। সে সংযমের একমাত্র উপায় সৃজনী-বৃত্তির বিকাশ। সঞ্চয়-বৃত্তির আত্যন্তিক বিকাশ ও তাহার ফলস্বরূপ দুঃখসৃষ্টির একমাত্র প্রতিষেধক এই সৃজনী-বৃত্তির (creative instinct) বিকাশের উপায় করা। যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টি করিবার আনন্দ-

বোধে সে সঞ্চয় করিতে চাহে না, অন্ততঃ চাহিলেও তাহার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিবার অবকাশ তাহার বড় বেশী থাকে না। শিশুকে শিখাইতে হইবে, সঞ্চয় করা ভাল (তাহাকে আমরা অমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শী করিতে চাহি না), কিন্তু তাহার চেয়েও ভাল সৃষ্টি করা। ইহার জন্য আমাদের বিদ্যালয়ে নানারূপ আয়োজন করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের নানা ব্যাপারে সেই আয়োজন—সৃজনীবৃত্তির বিকাশের অনুকূল একটি আবেষ্টন—সৃষ্টি করা যাইতে পারে। শুধু হাতের কাজে নহে, অভিনয়ে, লেখাপড়ায়, ক্রীড়ার অঙ্গনে সর্বত্রই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর, হাতের কাজ বলিতে মামুলিভাবে আমরা যাহা বুঝি—অর্থাৎ একটু কাঠের কাজ বা মাটির কাজ, কিছু সূচীশিল্প বা সেইরূপ একটা কিছু—শুধু তাহার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না। মানুষের সৃজনী-শক্তির বিকাশ বিচিত্ররূপ গ্রহণ করে। যতদূর সম্ভব আমাদের আয়োজনকে সেই বৈচিত্র্য দান করিতে হইবে।

এই সৃজনীবৃত্তি-পরিচালনার বাহ্য ফলকে আর্থিক মাপকাঠি দিয়া বিচার আমরা করিব না। একটি শিশু একখণ্ড বেত দিয়া একটি ঝুড়ি তৈয়ারি করিল, তাহার আর্থিক মূল্য হয়তো সামান্যই; কিন্তু তাহার প্রকৃত মূল্য অনেকখানি, তাহা পয়সার হিসাবে পাওয়া যায় না। সৃষ্টি করিবার আনন্দের ও আত্মপ্রসাদের আর্থিক মূল্য নির্ধারণ কে করিতে পারে? তাহার ফলে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে, তাহার হিসাবনিকাশই বা কে দিতে পারে?

আজকাল অনেকের মুখে vocational education অর্থাৎ অর্থকরী শিক্ষার কথা শোনা যায়। তাঁহারা বলেন, শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে শিক্ষার্থী অর্থ-উপার্জন-ব্যাপারে সহায়তা লাভ করিতে পারে। এ কথা আংশিকভাবে স্বীকার করিলেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করিতে পারি না। যে বয়সের ছাত্রছাত্রীগণকে লইয়া আমাদের প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলির কাজ, সে বয়সের শিশুকে অর্থ-উপার্জন-ব্যাপার হইতে দূরেই রাখিতে হইবে। Vocational education শিক্ষা-ব্যবস্থার দ্বিতীয় ধাপের ব্যাপার। তাহার স্থান প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নহে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রচারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন আমাদের তাহা নাই। অন্যান্য দেশে ইহার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে বর্তমানে তাহা সম্ভব নহে। তাহা ছাড়া, এখনও ইহার চাহিদা দেশে এতটা হয় নাই যে, দেশের জনসাধারণ ইহার জন্য অর্থ সাহায্য করিবে। অর্থব্যয় করিতে পারিলে যতগুলি শিক্ষক আমরা নিয়োগ করিতে পারিতাম তাহা আমরা পারিব না। সুতরাং আমাদের আয়োজনও তদনুযায়ী সংক্ষেপ করিতে হইবে। যেখানে অন্যদেশে একাধিকজন শিক্ষক কাজ করেন সেখানে আমাদের মাত্র একজনকে লইয়া কাজ চালাইতে হইবে। আমাদের কার্যক্ষেত্রও সঙ্কুচিত করিতে হইবে। হয়তো যেখানে পাঁচ বৎসরের শিক্ষার আয়োজন করিলে ভাল হইত, সেখানে তিন বৎসরের শিক্ষার

ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। হয়তো গ্রামের ধনীদরিদ্র সকলের জন্য বিদ্যালয় খুলিলে ভাল হয়, কিন্তু আমাদের শক্তি পরিমিত বলিয়া শুধু দরিদ্র ও বঞ্চিত সম্প্রদায়ের সন্তানগণেরই শিক্ষার ভার আমাদের লইতে হইবে। হয়তো সকল বয়সের শিশুর জন্য ব্যবস্থা না করিয়া ৭ হইতে ১০ বৎসরের শিশুদের জন্যই আমরা আয়োজন করিব। হয়তো যে আসবাব-পত্রাদি আমাদের প্রয়োজন হইবে, তাহার সবটাই আমরা সংগ্রহ করিতে পারিব না। আমাদের চেষ্টা সংযত ও আরম্ভ সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের আদর্শকে আমরা কোনদিন সঙ্কীর্ণ করিব না। আমাদের বিদ্যালয়কে প্রথম হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে, কারণ আমরা পড়ানর চেয়ে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির দিকে বেশী দৃষ্টি দিব। সেই আবেষ্টন যতদিন না ক্রিয়াশীল প্রাণবান হইয়া উঠে ততদিন বিরুদ্ধ শক্তির সহিত সংঘর্ষে তাহার ক্ষতি হইবে। সুতরাং হয়তো প্রথম বৎসর ৭।৮টি শিশুকে লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে এবং ধীরে ধীরে কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইবে।

এতক্ষণ আমি 'প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধেই বলিয়াছি। কিন্তু প্রবন্ধের আরম্ভে আমাদের এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অন্য একটি কর্তব্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছিলাম, সেই কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।

এককালে আমাদের গ্রাম্য জীবনের কেন্দ্র ছিল চণ্ডীমণ্ডপ, দেবায়তন ও মসজিদগুলি। আজ পল্লীসমাজ ভগ্নপ্রায়, পল্লীর

প্রাণকেন্দ্র কোন আশ্রয় পাইতেছে না। আজ যখন আমরা সেই ভগ্নপ্রায় পল্লীসমাজ পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতেছি তখন আমাদের প্রথম কাজ হইবে সেই কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা।

আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে কিছু পরিমাণে সেই কেন্দ্রের ভারও আজ গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ করিয়া সেগুলিকে গণশিক্ষার (adult education) ভার লইতে হইবে। তাহার প্রথম কাজ হইবে বিদ্যালয়ের সহিত পিতামাতার ঘনিষ্ঠ যোগ-সাধন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলে ধীরে ধীরে আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া তাঁহাদেরও শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে। অনেক পিতামাতারা মনে করেন সন্তানপালন খুব সহজ কাজ। অথচ এ কথা অত্যন্ত সত্য যে, সাধারণ পিতা-মাতা এ সম্বন্ধে নিতান্ত অজ্ঞ। সুতরাং আমাদের বিদ্যালয়ে তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিবার আয়োজন করিতে হইবে। তাহাই হইবে গণশিক্ষার প্রথম ধাপ। তাহার পর ধীরে ধীরে অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, গণশিক্ষার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয় নহে, আলাপ-আলোচনা-সভা।

এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বোঝা যাইবে যে, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারটা আমরা যেরূপ সহজ বলিয়া মনে করি তাহা মোটেই সেরূপ নহে। সুতরাং সেই শিক্ষাদানব্রত গ্রহণ করিতে হইলে আমাদের অসীম ধৈর্য ও কঠিন সাধনার প্রয়োজন হইবে।

[২]

এতক্ষণ আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদর্শের কথাই বলিয়াছি। এইবার তাহার গঠন, রূপ ও কার্যক্রম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ বিদ্যালয়গুলি পল্লীগ্রামের বঞ্চিত ও দরিদ্র শ্রেণীর ৭ হইতে ১০ বৎসর বয়স্ক ছাত্রদের জন্যই হইবে। অবস্থা বুঝিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো বালিকাদের ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রগণকেও বিদ্যালয়ে লওয়া হইবে। তবে আমরা বিশেষ করিয়া পূর্বোক্ত শ্রেণীর বালকদের উপযোগী করিয়াই শিক্ষাপ্রণালী গড়িয়া তুলিব। অন্যান্য শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। সুতরাং তাহাদের উপযোগী প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উচ্চতর শিক্ষা-প্রণালীর সহিত মিলাইয়া চলিতে হয়। ইহাতে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতি হয়। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় যে শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য তাহারা এইখানেই বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিবে। এইজন্য এই শিক্ষা, এক হিসাবে স্বয়ং-পর্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন; এবং এইজন্য ইহার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা প্রয়োজন। এ কথাও এইখানে উল্লেখ করিয়া রাখা দরকার যে, ছাত্রদের কোন বৃত্তিপরীক্ষার উপযোগী করিয়া তোলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

বর্তমানে কর্মীর অভাবে, পাঠ্যক্রম তিন বৎসরের উপযোগী করিতে হইবে এবং ছাত্রসংখ্যা ত্রিশের অনধিক নির্দিষ্ট করিতে হইবে। এই ত্রিশজন ছাত্রকে লইয়া মোটামুটি তিনটি শ্রেণী

গঠিত হইবে। তবে এইখানেই বলিয়া রাখা দরকার যে, এই শ্রেণীবিভাগ শিক্ষার জন্য নহে, সে হিসাবে প্রত্যেক ছাত্রই এক একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত; শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজন কার্যের সুবিধার জন্য, হিসাব রাখিবার জন্য। বৎসরের যে-কোন সময়েই প্রয়োজন হইলে ছাত্রগণকে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারিবে। তবে সাধারণতঃ এরূপ শ্রেণী-পরিবর্তন বৎসরের মধ্যে দুই বারের অনধিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় বৎসর ব্যতীত অন্য দুইটি বৎসর পরীক্ষা বলিতে আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি তাহার ব্যবস্থা থাকিবে না। শিক্ষক প্রত্যেক ছাত্রের জন্য পৃথক বহি রাখিয়া তাহাতে তাহার শিক্ষার উন্নতির হিসাব রাখিবেন। তাহারই উপর নির্ভর করিয়া শ্রেণী-পরিবর্তন করা হইবে। এ বিষয়ে শিক্ষকের মতামতই একমাত্র মাপকাঠি হইতে পারে।

বৎসরারম্ভ ঃ

বিদ্যালয়ের বর্ষারম্ভের একটি নির্দিষ্ট সময় থাকিবে। সেই সময়েই ছাত্রগণকে ভর্তি করা হইবে। বৎসরের মধ্যে যখন-তখন ছাত্র ভর্তি করিলে শিক্ষার অসুবিধা হয়। ছাত্র ভর্তি করার সময়ে অভিভাবকগণকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, তাঁহারা বিদ্যালয়ের নিয়মপালন সম্বন্ধে শিক্ষকের সহযোগিতা করিবেন এবং তিন বৎসর কাল ছাত্রদের বিদ্যালয়ে রাখিবেন। বিদ্যালয় সম্বন্ধে এই দুইটি নিয়মের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। যে শ্রেণীর ছাত্রদের লইয়া

আমাদের কাজ করিতে হইবে তাহাদের মাতাপিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহী নহেন। ফলে ছেলেরা যথাসময়ে বিদ্যালয়ে আসিল কিনা, বিদ্যালয়-নির্দিষ্ট কাজ করিল কিনা, সে বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে না। শিক্ষকের সে বিষয়ে দৃষ্টি দিবার অবসর নাই। সুতরাং এ ভার অভিভাবকগণেরই হাতে দিতে হইবে। অনেক সময় আবার দেখা যায়, কোন ছাত্র কিছুদিন বিদ্যালয়ে আসিয়া পরে আসা বন্ধ করিয়া দেয়। ইহাতে দুই দিক দিয়া ক্ষতি হয়। প্রথমতঃ তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ে অন্য ছাত্রদের জন্য স্থানাভাব। এরূপ ছাত্রের পরিবর্তে যে ছেলে বেশীদিন থাকে, সেরূপ ছাত্র লইলে তাহার উদ্দেশ্য সফলতর হইবে। এইজন্যই এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার দরকার রহিয়াছে।

ছুটি ঃ

সাধারণতঃ সামাজিক ও গ্রাম্য উৎসব ও পর্বদিনগুলিতে বিদ্যালয় বন্ধ থাকিবে। তাহা ছাড়া, বর্ষাকালে ও ফসল কাটার সময় দীর্ঘ ছুটির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই হিসাবে বিদ্যালয়ের বৎসরকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারিবে।

কার্য-সময় ঃ

বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ কোন্ সময়ে করিলে সুবিধা হয় তাহা নির্দেশ করা কঠিন। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিষয়ে

হয়তো বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হইবে। তবে, আমাদের মনে হয়, মধ্যাহ্নের পর ১টা হইতে ৪টা বা ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত বিস্থালয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে॥ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে প্রাতঃকালই বিদ্যাশিক্ষার পক্ষে প্রশস্ততম সময়। কিন্তু সাধারণতঃ ছেলেরা এ সময় ঘরের কাজ করে। তাহাদের জীবনে এরূপ কাজের মূল্য শিক্ষার দিক দিয়াই যথেষ্ট আছে। সুতরাং সে কাজ হইতে তাহাদের ছাড়াইয়া লওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। তবে যদি কোথাও সুবিধা হয় ও অভিভাবকগণের সম্মতি পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাতঃকালেই বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও খেলাধূলার জন্য ছাত্রদের বৈকালে বিদ্যালয়ে আসার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের কাজ মোটের উপর তিন ঘণ্টা ধরিয়া চলিবে। কিভাবে সেই তিন ঘণ্টা কাল ভাগ করা হইবে, তাহা পাঠ্যক্রম আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিব।

আসবাব-পত্র ঃ

বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এইখানে বলা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকা উচিত। ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয় ও ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক কোনটিতে শিক্ষার কাজ ভালভাবে চলিতে পারে না। আলোহাওয়া প্রচুর আছে এমন একটি প্রশস্ত ঘর যাহাতে ত্রিশজন ছাত্র একত্র স্বচ্ছন্দে বসিতে ও চলাফেরা করিতে পারে, সংলগ্ন কিছু জমি খেলাধূলা ও বাগান করিবার জন্য, ইহার অধিক আশা করা বর্তমানে সম্ভব নহে। কিন্তু এটুকু

না হইলে চলিবে না। সেই সঙ্গে একটি ছোট গ্রন্থাগার, ছেলেদের পড়িবার উপযোগী পর্যাপ্তসংখ্যক পুস্তক, ভূমণ্ডল এশিয়া ভারতবর্ষ বাংলাদেশ ও জেলার মানচিত্র, একটা গ্লোব, অভিধান, কতকগুলি বড় ছবি ও কয়েকটি ছবির বই, দুই-তিনটি ব্ল্যাকবোর্ড, এগুলি না থাকিলে বিদ্যালয়ের কাজ করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া, হাতের কাজের জন্যও কিছু ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বাগানের কথা বলিয়াছি; ছেলেরা ও শিক্ষক মিলিয়া সেই বাগানে কাজ করিবেন। শিক্ষার দিক দিয়া এরূপ কাজের যথেষ্ট মূল্য আছে। ইহাকে খেলার অঙ্গীভূত করিয়া তুলিতে হইবে। সাধারণতঃ খেলা বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার জন্যও কিছু আয়োজন রাখিতে হইবে। তবে দেশী খেলার জন্য সৌভাগ্যক্রমে বিশেষ আয়োজন লাগে না; সুতরাং আমাদের সেই দিকেই জোর দিতে হইবে।

এই বিদ্যালয়গুলিকে অবৈতনিক করিতে হইবে। তবে অভিভাবকগণ শিক্ষকের ভরণপোষণের জন্য যদি স্বেচ্ছায় কিছু দান করেন, সে দান গ্রহণ করা উচিত। অবৈতনিক বিদ্যালয়ের একটি অসুবিধা এই যে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য এখানে কোনরূপ অর্থব্যয় বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই অভিভাবক ও ছাত্রগণের মনে ইহার মর্যাদা কিছু পরিমাণ ক্ষুণ্ণ হয়। এইজন্যই প্রতিদান স্বরূপ অভিভাবকগণের নিকট কিছু লওয়া দরকার হইয়া পড়ে। তবে অন্য উপায়ে মর্যাদা রক্ষা করা চলে এবং শিক্ষকের পক্ষে সেই উপায় অবলম্বন করা শ্রেয়।

কিন্তু যে সম্প্রদায়ের জন্য আমাদের বিদ্যালয়, তাহা এতই দরিদ্র যে শুধু অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেই চলিবে না, ছাত্রদের লেখাপড়ার সরঞ্জাম, বইখাতাও যোগাইতে হইবে। সেগুলি সর্বদা বিদ্যালয়-গৃহেই রাখিতে হইবে, ছাত্রগণ প্রয়োজন-মত সেগুলি ব্যবহার করিবে।

পাঠ্যক্রম ঃ

এইবার পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে বলি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে; আমি পাঠ্যক্রমের মূল ধারাগুলি মাত্র নির্দেশ করিয়াছি। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এ ব্যাপারে শিক্ষকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। তিনি প্রয়োজনমত পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন করিতে পারেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরও কিছু পরিমাণে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন নির্ভর করে।

ইতিপূর্বে আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বাংলা ও অঙ্ককে আমি অবহেলা করিয়াছি এবং পাঠ্যক্রমে ইহাদের স্থান অত্যন্ত নিম্নে। বরং এক হিসাবে এই দুইটিকে পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রীভূত বিষয় বলা চলিতে পারে। সহযোগিতাবোধ সৃষ্টি, চরিত্রগঠন, স্বাধীনতার বিকাশ প্রভৃতির আশ্রয় প্রয়োজন। কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের অনুশীলনের দ্বারাই সে সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। আমার প্রধান বক্তব্য এই যে, বিষয়শিক্ষার উপর বেশী জোর দিয়া সেইগুলিকে একান্ত ও একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে

শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। যথাস্থানে যথোপযুক্তভাবে বিষয়গুলিকে ব্যবহার করিতে হইবে।

বাংলা ভাষা ও অঙ্ককে আমি এক হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রীভূত দুইটি বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। এই দুইটিই শিক্ষার প্রধান সাধন। ইহাদের প্রয়োজনীয়তা সেইখানেই। প্রাথমিক শিক্ষার শেষে ছাত্র যেন বাংলা ভাষা আয়ত্ত করিতে পারে, বাংলা লিখিতে এবং পড়িতে, বাংলা সাহিত্যের কিছু পরিমাণ রস গ্রহণ করিতে পারে এবং যতখানি অঙ্ক তাহার দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন হয় তাহা শিখিতে পারে। কিন্তু ভাষা ভাবের ও চিন্তার বাহন। চিন্তাহীন, ভাবহীন ভাষার কোন মূল্য নাই। সুতরাং ভাষা ভাল করিয়া শিখিতে গেলেও ভাবের সহিত পরিচয় স্থাপন করা প্রয়োজন। সেই ভাবগুলিই সংহত ও সুসংবদ্ধ হইয়া বিষয়ে পরিণত হয়। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি এই হিসাবে জ্ঞান-সাম্রাজ্যের এক একটি ক্ষুদ্র অংশ বিশেষ। বিজ্ঞানও সেইরূপ একটি অংশ; চারিদিকের প্রকৃতির সহিত সত্য পরিচয় স্থাপন তাহার উদ্দেশ্য।

সুতরাং মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এই বিষয়গুলি বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থান লাভ করিবে—বাংলা ভাষা (লেখা ও পড়া), অঙ্ক, ইতিহাস ও ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান বা প্রকৃতি-পরিচয়, অঙ্কন ও হাতের কাজ, গান, ব্যায়াম ও খেলা। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকের শিক্ষার অভাবে ইহাদের মধ্যে

একটি দুইটি বিষয় বাদ দিতে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, সেরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা অপূর্ণ ও অঙ্গহীন হইবে।

আমি যে বিষয়গুলির কথা বলিয়াছি, এখন তাহাদের এক একটি লইয়া সংক্ষেপে আলোচনা করিব। তাহার পূর্বে আর একটি বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন।

প্রাথমিক পাঠ্যরূপে গল্পের স্থান অতি উচ্চ। গল্পের সাহায্যেই ছেলেদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গল্পের ও আলোচনার ভিতর দিয়াই ছেলেরা শিখিবে। এই সকল বিষয়ে ছেলেদের হাতে কোন পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হইবে না। শিক্ষক যাহা বলিবেন ও নিজেদের মধ্যে আলোচনায় যাহা পাওয়া যাইবে ছাত্রগণ তাহাই অবলম্বন করিয়া লিখিবে এবং তাহাদের লিখিত বিবরণগুলিই পাঠ্যপুস্তকের স্থান অধিকার করিবে।

সুতরাং শিক্ষককে গল্প বলিতে শিখিতে হইবে। গল্প বলার একটি বিশেষ আর্ট আছে; তাহা জানা না থাকিলে ঠিকভাবে কাজ চলে না।

এই প্রসঙ্গে পাঠ করিয়া শোনানর কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। সাহিত্য-বিষয়ক নানা গ্রন্থ ও অন্যান্য বিষয়ের গ্রন্থ হইতে ছেলেদের পড়িয়া শুনাইতে হইবে। গল্প বলার সহিত পড়িয়া শোনানর নিকট-সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই দুইটি ব্যাপারকে পাঠ্যক্রমের আবশ্যক অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বাংলা ঃ

বাংলা সম্বন্ধে মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাঠ্যক্রমের ইহাই কেন্দ্র। বাংলা শিক্ষার উদ্দেশ্য ছাত্রগণকে বাংলাভাষায় লিখিবার ও পড়িবার অধিকার দান ও তাহাদের মধ্যে কিছু পরিমাণে বাংলাসাহিত্যের রসবোধ জাগ্রত করা।

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ছাত্রগণ প্রথম যখন বিদ্যালয়ে আসিবে তখন লেখাপড়ার সহিত কোন পূর্বপরিচয় লইয়া আসিবে না। সুতরাং বিদ্যালয়েই বর্ণপরিচয়-বিধানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক সময়ে ইহার জন্য এমন উপায় গ্রহণ করা হয়, যাহার ফলে অক্ষর-পরিচয় করিতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং ভাষাশিক্ষার প্রতি শিশুর মনে বিতৃষ্ণাই জাগে। এ বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া একান্তই প্রয়োজন। অক্ষরকে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ধাপরূপে গ্রহণ না করিয়া কথাবোধকে এই ভার অর্পণ করিলে বর্ণপরিচয় সহজতর হয়। সঙ্গে সঙ্গেই লেখাও শেখান যাইতে পারে। উদ্দেশ্যহীন লেখার দ্বারা কোন উপকার হয় না। সুতরাং প্রথম হইতেই শিশু যেন লেখার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে এবং লিখিয়া আনন্দ লাভ করে।

এইজন্য বাজারে প্রচলিত প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি পুস্তক সাধারণতঃ কোন কাজে আসে না। এখানে প্রস্তাবিত প্রণালী অনুসারে কাজ করিতে গেলে নিজেদেরই পুস্তক রচনা করিতে হইবে। ইহাতে প্রথমটা একটু কষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু পরে কাজ সহজ হয় এবং শিশুদেরও শিখিতে সময় কম

লাগে। কথার সাহায্যে বর্ণপরিচয় হওয়ার পর যুক্তাক্ষরবর্জিত সহজ ভাষায় লেখা গল্পের ও ছড়ার বই ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহার পর যুক্তাক্ষরের সহিত ধীরে ধীরে পরিচয় করান চলে। শিশুর পরিচিত ও ব্যবহারযোগ্য শব্দের সাহায্যেই শিশুর কাজে লাগে এমন অক্ষরগুলি প্রথমে শেখান উচিত। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারি, ঢ্য, ঘ্ন, ন্ধ যুক্তাক্ষরগুলি আমাদের সাধারণতঃ খুব কমই প্রয়োগ করিতে হয়, সুতরাং এগুলি পরে শেখান যায়। যে জ্ঞান ব্যবহারে লাগে না তাহা বোঝামাত্র।

লেখা ও পড়া সঙ্গে সঙ্গে চলা দরকার; অকারণ লেখার (যথা—মক্স করা, শুধু অক্ষর বারবার করিয়া লেখা) মূল্য অত্যন্ত কম। লেখার আগ্রহ যেন শিশুর মনে আপনা হইতেই জাগে, সে দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

প্রথম হইতেই উচ্চারণের স্পষ্টতার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এজন্য নানাবিষয়ে আলাপ করা, ছেলেদের দিয়া গল্প বলান ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

ছোট ছোট কবিতা ও ছড়া শিখাইয়া শিশুর মনে ছন্দোবোধ জাগান প্রথম থেকেই দরকার। গান এ কাজে অনেকটা সহায়তা করে। কবিতা শিশুসাহিত্যের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া থাকিবে। কবিতা নির্বাচনে রসের দিকেই প্রধান লক্ষ্য রাখিতে হইবে। নীতিমূলক নীরস কবিতাগুলি কোন কাজেই লাগে না।

ভাল ভাল গ্রন্থ হইতে পড়িয়া শোনাইলে শিশুদের মনে সহজে সাহিত্যরসবোধ জাগে। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ের

গ্রন্থাগারে শিশুপাঠ্য নানাবিষয়ক গ্রন্থ রাখিতে হইবে। সেগুলির যথাযথ ব্যবহার সাহিত্যশিক্ষারই অঙ্গীভূত।

রচনার আগ্রহ শিশুর মনে যাহাতে প্রথমেই জাগে তাহার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বিষয়নির্বাচনের ভার শিশুরই উপর দেওয়া উচিত। রচনার বিষয়গুলি চিত্তাকর্ষক হওয়া ও তাহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকা একান্ত প্রয়োজন।

প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাকরণ শিখাইবার কোন দরকার নাই।

অঙ্ক ঃ

প্রাত্যহিক জীবনে অঙ্কসংক্রান্ত যে সকল সমস্যা আসে, তাহাদের কেন্দ্র করিয়াই পাঠ্যক্রম নির্দেশ করা প্রয়োজন। বিষয়নির্বাচনে জীবনে ব্যবহারই একমাত্র মাপকাঠি হইবে। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের বহুল পরিবর্তন দরকার। উদাহরণস্বরূপ ছয়রাশির গুণের কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরূপ অঙ্ক কষিবার কদাচ প্রয়োজন হয়।

মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে, প্রথম চারিটি নিয়ম, মিশ্র-রাশির (অর্থাৎ টাকা, মণ, বিঘা, ঘণ্টা প্রভৃতি সম্বন্ধীয়) ব্যবহার, লঘূকরণ, কিছু পরিমাণ দশমিক, সুদকষা, জমির জরিপ, এইগুলিই অঙ্কের পাঠ্যক্রমে স্থান লাভ করিবে। সেই সঙ্গে কিছু শুভঙ্করী ও ব্যবহারিক জ্যামিতি শিখাইবার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। জমিদারী ও মহাজনী হিসাব শেখানরও দরকার আছে। সুতরাং তাহাদের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

এক হিসাবে সমস্ত অঙ্কই মানসাঙ্ক। সুতরাং মানসাঙ্কের দিকে যথেষ্ট জোর দিতে হইবে।

প্রাচীন প্রথামত ধারাপাতের ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই। লঘূকরণ আয়ত্ত হইলে ধারাপাতের অনেকখানি সহজে শেখা হইয়া যায়। নামতা শেখানর সময় প্রথম বৎসরের মাঝামাঝি কাল। তাহার পূর্বে ছেলেরা সহজ গুণ শিখিবে। অনেক সময়ে ছেলেদের দিয়া নামতা তৈয়ারি করাইয়া শিখাইলে ভাল হয়। নামতার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ শিখাইতে হইবে।

প্রথমে বস্তুর সাহায্যে ২০ পর্যন্ত গণনা ও চারিটি নিয়মের সহজ প্রয়োগ শেখান দরকার। পরে বস্তুর পরিবর্তে সংখ্যার ব্যবহার শিখাইতে হইবে। তাহার পর ধীরে ধীরে বৃহত্তর সংখ্যাগুলির সহিত পরিচয় করাইতে হইবে।

কোন একটি নূতন নিয়ম শিখাইবার পূর্বে ছাত্রের জীবনের কোন্ সমস্যার সমাধানে তাহার ব্যবহার প্রয়োজন সেদিকে ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। তাহার পর নিয়ম শেখান চলে। মোটের উপর, দৈনন্দিন জীবনে অঙ্কসংক্রান্ত যে সকল সমস্যা আসে, সেগুলিকে একে একে লইয়া অঙ্ক শিখাইতে হইবে। ছেলেদের সাংসারিক জমাখরচ ও খাতা রাখিতে শিখাইতে হইবে।

দ্বিতীয় বৎসরেই ব্যবহারিক জ্যামিতি আরম্ভ করান যায়। ইহার প্রথম ধাপ কাগজ কাটা, বাক্স তৈয়ারি করা। ধীরে ধীরে তাহা হইতেই শেষে জমির মাপ, বর্গফল, প্রাথমিক জরিপ ইত্যাদি শেখান যাইতে পারিবে।

ইতিহাস ঃ

ইতিহাসের জন্য ছেলেদের হাতে কোন পাঠ্যপুস্তক দেওয়া অনুচিত। এক হিসাবে ইতিহাসকে বাংলার অন্তর্গত করা চলে। প্রথমে গল্পের আকারে ইতিহাস আরম্ভ করিতে হইবে। ব্যক্তি বা বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এরূপ গল্প বলিতে হইবে। তাহারা যে ইতিহাস পড়িতেছে, এ কথা ছেলেদের বুঝিতে না দেওয়াই কর্তব্য। গল্পের আকারে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসই বলিয়া দেওয়া যায়। কালবোধ, সময়ের পারম্পর্য প্রথমে ছেলেদের মনে জাগে না। ধীরে ধীরে জাগ্রত করা যাইতে পারে। ইতিহাস অধ্যাপনায় ছবির সাহায্য লওয়া প্রয়োজন।

ইতিহাস শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য দেশের অতীত ও বর্তমানের মধ্যে যোগ স্থাপন। আমাদের জীবনে এখন যাহা ঘটিতেছে অতীতে তাহার মূল রহিয়াছে, এটা দেখানই ইতিহাসের কাজ। যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির উপর জোর না দিয়া লোকপ্রবাহ ও সমাজের রূপান্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইতিহাস পড়াইতে হইবে। এটা অবশ্য তৃতীয় বৎসরে চিন্তা করিবার বিষয়। প্রথম দুইটি বৎসর গল্পের আকারেই ইতিহাস শেখা চলিবে।

তিন বৎসর শেখার পর ছেলেরা যেন ভারতবর্ষের ইতিহাসের রেখাদর্শনের সহিত পরিচয় লাভ করে। তৃতীয় বৎসরে এইসঙ্গে বর্তমান গবর্ণমেণ্ট ও তাহার কার্যপ্রণালী, আইন ও অধিকার, স্বায়ত্তশাসন এবং ইউনিয়ন বোর্ড সম্বন্ধে মোটামুটি একটা জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

ভূগোল ঃ

ইহার দুইটি দিক আছে; একটি বিজ্ঞানের অন্তর্গত, অপরটি মানুষের চলাচল সম্বন্ধীয়। প্রকৃতির সহিত পরিচয়ের ভিতর দিয়াই চাষ, বাজার, পণ্য ইত্যাদি আলোচনা করা যাইতে পারে। আর এক দিক দিয়া নানাদেশের লোকের কথা, তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী ইত্যাদি আলোচনা করিয়া ভূগোল শেখান যায়। সুতরাং উভয় প্রকারেরই শিক্ষা দিতে হইবে। ভূগোল-শিক্ষায় চিত্রের সাহায্য লওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ভ্রমণ-কাহিনীর বর্ণনা পড়িয়া শোনাইলে ছেলেদের মনে স্বাভাবিক আগ্রহ জাগে।

ম্যাপের ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ম্যাপের সহিত জরিপের যোগ কার্যতঃ বুঝাইয়া দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ছেলেরা জরিপ ম্যাপ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে বড় বড় ম্যাপ আঁকিতে শিখিবে।

ভূগোলের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের পরস্পর নির্ভরশীলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

ভৌগোলিক সংজ্ঞাশিক্ষার কোন মূল্য নাই, এবং ইহা গল্পের ছলে প্রথমে আরম্ভ করা যাইতে পারে। অনেকে বলেন, প্রথমে ঘরের কথা লইয়াই ভূগোল আরম্ভ করিতে হইবে। এ কথা যুক্তি-যুক্ত নহে! দেশবিদেশের কথা শুনিবার জন্য ছেলেদের মনে একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। তাহা কাজে লাগান উচিত। সুতরাং একই সঙ্গে ঘর ও বাহিরের কথা লইয়া আরম্ভ করিতে পারা যায়।

ভূগোলের জন্য কোন নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক গোড়ায় ছেলেদের হাতে না দিলেই চলিবে।

শিক্ষার শেষে ছেলেরা যেন নিজের জেলা ও বাংলাদেশের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে এবং ভারতবর্ষ ও জগৎ সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা তাহাদের মনে জন্মায়।

প্রাথমিক বিজ্ঞান ঃ

আমাদের চারিদিকে যে প্রকৃতি রহিয়াছে, যাহার মধ্যে অহরহ নানাভাবের বিচিত্র লীলা চলিতেছে, তাহারই সহিত শিশুর পরিচয় স্থাপন করা এবং সেই লীলারস আস্বাদন করানই প্রাথমিক বিজ্ঞানশিক্ষার উদ্দেশ্য। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ। সুতরাং প্রাথমিক বিজ্ঞান বলিতে আমরা বিশেষ কোন একটি বিজ্ঞান বুঝিব না। শিশুর সহিত যে প্রকৃতির পরিচয় হয় তাহার মধ্যে কিছুটা জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিছুটা উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, কিছুটা আবার বস্তুবিজ্ঞানের মধ্যে আসিয়া পড়ে। সুতরাং ইহাদের প্রত্যেকটিরই কিছু কিছু অংশ আলোচনা করিতে হইবে।

অনুসন্ধান ও পরীক্ষা বিজ্ঞানশিক্ষার এই দুইটি প্রশস্ত উপায়। পুস্তক পড়িয়া বিজ্ঞান শেখা ঠিক চলে না। সুতরাং এ বিষয়ে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকিতে পারে না। চারিপাশের বিশ্বপ্রকৃতিই এক হিসাবে বিজ্ঞানশিক্ষার সবচেয়ে ভাল পাঠ্যপুস্তক। ছেলেরা তাহারই এক একটি বিশেষ প্রকাশ অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিবে। ছেলেদের প্রতিদিন গাছপালা, জীবজন্তু,

পোকা-মাকড়, আকাশ-বাতাস আলোর সম্পর্কে আসিতে হয়। শিক্ষক তাহার এক একটি লইয়া বিজ্ঞানশিক্ষার সূত্রপাত করিবেন।

বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথম, বাহ্য প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা। ছেলেদের মধ্যে যাহাতে অনুসন্ধিৎসা ও জিজ্ঞাসাবোধ জাগে এবং তাহাদের মন ও দৃষ্টি সজাগ হয়, সে বিষয়ে নানা ভাবের অনুশীলন প্রয়োজন। প্রথম বৎসর এইজন্য প্রথমে sense-training-এর ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরত্ব, উচ্চতা, ওজন, রং প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহাতে ছেলেদের মনে সম্যক্ ধারণা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এই উপলক্ষ্যে নানা রকমের খেলা সৃষ্টি করা যায়। পর্যবেক্ষণশক্তি অনুশীলনের দ্বারা বাড়ে; সুতরাং তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। প্রশ্নের দ্বারা ছেলেদের মধ্যে জিজ্ঞাসাবোধ জাগান যায়। সুতরাং প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা প্রয়োজন। নিয়মিতভাবে ছেলেদের লইয়া বেড়াইতে যাওয়ার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তখন প্রসঙ্গক্রমে নানা প্রশ্ন ও আলোচনার অবতারণা করা যাইতে পারে।

চারিপাশের গাছপালা, পশুপাখীর নাম, তাহাদের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক শিশু অজ্ঞ। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে উৎসাহ দিতে হইবে। ছেলেরা কোন্ ঋতুর কি বিশেষত্ব, কখন কোন্ ফসল হয়, কোন্ ফুল ফোটে, কোন্ ফল ধরে, কোন্ পাখী দেখা যায় ইত্যাদি সম্বন্ধে সন্ধান করিবে। সকলে মিলিয়া বিদ্যালয়ে একটি museum তৈয়ারি করিতে পারে। বিদ্যালয়ে পশুপাখী পালনের ব্যবস্থা নানাভাবে শিক্ষাপ্রদ। পশুপাখীর ভার

ছেলেদের দিলে তাহারা শিক্ষা ও আনন্দ উভয়ই লাভ করে। এ সকল কাজের সমস্তটিই যে বিদ্যালয়ের সময়ের মধ্যেই করিতে হইবে এমন নহে। এগুলিকে অবসরবিনোদনের উপায়স্বরূপও গ্রহণ করা যাইতে পারে। এগুলিকে আবশ্যিক এবং পাঠ্য বিষয়ে পরিণত করিলে ছেলেদের মনে অনেক সময়ে আগ্রহ থাকে না; সুতরাং এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

ছেলেরা যাহা দেখিবে তাহার বিবরণ যেন প্রথম হইতেই লিখিতে শেখে।

সময়ে সময়ে কাজ ভাগ করিয়া দিলে সহযোগিতাবোধও বৃদ্ধি পায় এবং কাজও সহজ হইয়া ওঠে। তাহা ছাড়া, সকলেই যদি সর্বক্ষণ এক কাজ করে তাহা হইলে অনেক সময়ে অসুবিধা ও আগ্রহের অভাব ঘটে। শুধু বিজ্ঞান নহে, অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপনায়ও এই উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

ঋতুপর্যায়, গ্রহনক্ষত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা ভূগোলের অন্তর্গত। কিন্তু বোধ করি বিজ্ঞানশিক্ষার কালেই সেরূপ আলোচনা করিবার প্রশস্ততর সময়।

বাগানরচনা উপলক্ষ্যে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান শিক্ষা চলিবে। গৃহপালিত পশুপাখীর ব্যবহার জীবনযাত্রাপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে শিশু ধীরে ধীরে জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উৎসাহ বোধ করিবে। তাহার ফলে ক্রমে দেহ ও তাহার ক্রিয়া প্রভৃতির দিকে ছেলেদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। এইভাবে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত হইবে।

কিন্তু শুধু স্বাস্থ্যবিজ্ঞান আলোচনা করিলেই চলিবে না। ছেলেদের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। তাহারা যাহাতে নানারূপ খারাপ অভ্যাস ছাড়িয়া ভাল অভ্যাস শেখে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যে সম্প্রদায়ের বালকদের লইয়া আমাদের কাজ, তাহারা ও তাহাদের অভিভাবকগণ নানা কারণে স্বাস্থ্যের দিকে মন দিতে পারে না বা দেয় না। সময়নিষ্ঠা, স্নান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা, প্রত্যহ মুখ ধোওয়া প্রভৃতি সাধারণ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস তাহাদের মধ্যে বিরল। এইজন্য শিক্ষককে এই সকল বিষয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া নানারূপ খেলাধূলা ব্যায়ামের প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে পরে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

অঙ্কন ঃ

প্রথম হইতেই ছেলেদের চিত্রাঙ্কনের উৎসাহ দিতে হইবে। প্রকৃতি-পরিচয়ও অঙ্কনের উপাদান জোগাইবে। প্রথমাবস্থায় ছেলেরা খড়ি ও কয়লা দিয়া শ্লেটে অঙ্কন করিবে। সম্ভব হইলে রংএর ব্যবহার করান যাইতে পারে। এজন্য coloured crayons বা coloured chalk ব্যবহার করিতে পারা যায়। Model Drawing-এর বিশেষ মূল্য নাই। অঙ্কন বিষয়ে ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকা চাই। সুতরাং তাহাদের technique অর্থাৎ অঙ্কনপদ্ধতিটি দেখাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য কিছু পরিমাণে Drawing Books-এর সাহায্য লওয়া

যাইতে পারে। রঙীন কাগজ কাটিয়া নানারূপ ছবি আঁকা যায়। তাহা ছাড়া, পাতায় ভূষা মাখিয়া তাহার ছাপ লইয়া ছবি হয়। প্রথম অবস্থায় সেগুলি শেখান যাইতে পারে।

Mathematical Drawing শেষ বৎসরে ব্যবহারিক জ্যামিতির সঙ্গে শিখাইতে হইবে।

এককালে আমাদের দেশে হাতের লেখাকেও আর্টে পরিণত করা হইয়াছিল। অঙ্কনশিক্ষাপ্রসঙ্গে সে বিষয়ে কিছু কাজ করা উচিত। হাতের লেখা সুন্দর করাতে এবং সাজাইতে একটি স্বাভাবিক আনন্দ আছে। অযথা হাতের লেখা মক্স করিতে করিতে ও শাসনের ভয়ে অনেক সময়ে সে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়। সুতরাং এ বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে।

হাতের কাজঃ

মাটির কাজ অর্থাৎ clay-modelling সর্বপ্রকার হাতের কাজের মধ্যে অল্প খরচে হইতে পারে। সুতরাং সেটি প্রবর্তন করা সহজ। কিন্তু সকল ছেলেই যে একপ্রকার কাজে আনন্দ লাভ করিবে তাহা নহে। সুতরাং অন্যান্য রকমের হাতের কাজ যথাসম্ভব প্রবর্তন করিলে ভাল হয়। বেতের ও বাঁশের কাজে খরচ বেশী লাগে না। আসন, ফিতা প্রভৃতি বোনার জন্য ছোট ছোট তাঁতও অল্প খরচে চালান যায়। তকলিতে সূতা কাটা, দড়ি পাকান, শিকে তৈয়ারি করা প্রভৃতি কাজগুলিও প্রবর্তন করা যায়।

এ সকল কাজেই ছেলেদের স্বাধীনতা থাকা চাই। তাহা ছাড়া কাজের দাম আর্ট হিসাবে দেখিতে হইবে; অর্থের হিসাবে তাহার মূল্য নির্ধারণ করা চলে না।

হাতের কাজ করার পূর্বে ছেলেরা প্রথমে design করিয়া লইবে।

গান ঃ

গান শিক্ষার অত্যন্ত আবশ্যকীয় অঙ্গ। অথচ এদিকে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না। বিদ্যালয়ে গানের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বাউল, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালি, কীর্তন, নানা ধরণের গান যাহাতে ছেলেরা শেখে সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। সমবেত গানেরও ব্যবস্থা থাকা দরকার। দুর্ভাগ্যক্রমে অভিভাবকগণ গানকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। বিদ্যালয়ে তাঁহাদের লইয়া কীর্তন প্রভৃতি গানের আসর করিলে ধীরে ধীরে তাঁহাদের এই মনোভাব দূর হইতে পারে।

খেলা ও ব্যায়াম ঃ

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যায়ামের স্থান বিশেষ নাই। তৃতীয় বৎসরে এ বিষয়ে কিছু পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রথম হইতেই নানারূপ খেলার আয়োজন করিতে হইবে। খেলার ভিতর দিয়াই এই বয়সের শিশুদের ব্যায়ামের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। স্বাস্থ্যবিধান, আনন্দদান ও সহযোগিতাবোধ-জাগরণ, খেলার এই তিনটি উদ্দেশ্যের কোনটাই ক্ষুণ্ণ করিলে চলিবে না।

নানাভাবের দেশী ও বিদেশী খেলার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সেই সঙ্গে স্কাউট ও ব্রতচারী দল গঠন করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রচলিত খেলা ও নৃত্যগুলির প্রবর্তনও করা উচিত হইবে।

ঠিকভাবে ব্যবস্থা করিতে পারিলে ছেলেরা বাগানরচনাকেও খেলার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারিবে। সুতরাং সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

সমাজসেবা :

পথ তৈয়ারি করা, জঙ্গল কাটা, প্রভৃতি সমাজসেবার কাজগুলিও খেলার ছলে প্রবর্তন করিতে হইবে, অর্থাৎ ছেলেরা যেন এরূপ কাজে আনন্দ বোধ করে। এরূপ কাজের ভিতর দিয়াই তাহাদের মনে ধীরে ধীরে সমাজবোধ জাগ্রত হইবে। আবার সমাজবোধ জাগ্রত হইলেই ছেলেরা এভাবের কাজ করিবার প্রেরণা পাইবে। সুতরাং আলাপ-আলোচনা ও কাজ সকল দিক দিয়াই চেষ্টা করিতে হইবে। ছেলেরা যেন বোঝে সমাজের প্রতি তাহাদের কর্তব্য আছে এবং সমাজের মঙ্গলের সহিত তাহাদের সকলের মঙ্গল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে। এ বিষয়ে অবশ্য শিক্ষকের আদর্শই সকলের চেয়ে বেশী কাজ দেয়। সুতরাং শিক্ষকের এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নীতি ও ধর্মশিক্ষা :

পাঠ্যক্রম আলোচনাপ্রসঙ্গে এতক্ষণ আমি ইচ্ছা করিয়াই নীতি ও ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে কোন কথাই বলি নাই। ধর্ম ব্যক্তিগত

ব্যাপার, তাহা শিক্ষার বিষয় নহে। বই পড়িয়া বা বক্তৃতা শুনিয়া কেহ কোনদিন ধার্মিক হয় নাই। তাহা ছাড়া, যদিই ধরা যায় যে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন আছে তবে পরিবারকে সেই ভার লইতে হইবে। বিদ্যালয় অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান; সেখানে ধর্মশিক্ষার স্থান নাই।

নীতিশিক্ষাও বই পড়িয়া হয় না; তাহার মূলে রহিয়াছে আচার। "সত্য কথা বলিবে" এই উপদেশ দেওয়ার চেয়ে ছেলেরা যাহাতে আপনা হইতেই সত্যাচরণ করে এরূপ আবেষ্টনের সৃষ্টি করা অনেক বেশী মূল্যবান্। সত্য সুন্দর ও শিবের সাধনা আচারের সাহায্যে জীবন দিয়াই করিতে হয়। অনেক সময়ে নীতি উপদেশে বিপরীত ফল ঘটে। অবশ্য, অনেক সময়ে সৎ আদর্শ ছেলেদের নৈতিক জীবন গঠনের সহায়তা করে। সুতরাং সেইরূপ আদর্শ ছেলেদের সম্মুখে রাখা ও নৈতিক আচরণের উপযোগী আবেষ্টনের সৃষ্টি করা, বিদ্যালয়কে এই দুইটি কাজ করিতে হইবে। স্বভাবতঃই শিক্ষক ছেলেদের আদর্শ হন। ছেলেরা যদি তাঁহার জীবনে অনুক্ষণ সত্যাচারের দৃষ্টান্ত দেখে, তাঁহাকে অপরের কল্যাণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া নির্মল আনন্দ লাভ করিতে এবং যাহা কিছু অশোভন ও কুৎসিত তাহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিতে দেখে, তবে তাহার চেয়ে ভাল নীতিশিক্ষা আর কিছুই হইতে পারে না।

উৎসব ঃ

শিক্ষার কথা এইখানেই শেষ হইল। এখন আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ উৎসবের আয়োজন করিতে হইবে। এরূপ উৎসব অসাম্প্রদায়িক হওয়া চাই। বর্ষারম্ভ, বর্ষশেষ, ঋতু-উৎসব, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান অসাম্প্রদায়িকভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায়। উৎসবের প্রয়োজনীয়তার কথা পূর্বে বলিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এইটুকু বলিতে পারা যায় যে, এই উপলক্ষ্যে ছাত্রদের মধ্যে যতখানি ঐক্যবোধ জাগে অন্য কোনভাবে বোধ করি ততখানি হয় না।

শাসন ঃ

শাসন সম্বন্ধে একটি কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। নানা দিক দিয়া ছেলেদের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রথম দরকার মণ্ডলীগঠন। প্রতিদিন অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সকল ছাত্র সমবেত হইবার সুযোগ পাইলে তাহাদের মধ্যে সংঘবোধ জাগ্রত করা সহজ হয়। সেই সময়টি নানাভাবে ব্যয় করা যাইতে পারে। কখনও শুধু গান হইতে পারে, কখনও বা একদল ছেলে মিলিয়া বাকি সকলকে অভিনয় বা ব্যায়ামকৌশল দেখাইতে পারে, কখনও বা বিদ্যালয়ের অভাব-অভিযোগ, বিধিনিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে। মণ্ডলী গঠিত হইলে সেখানে শাসনসংক্রান্ত নিয়মগুলি

তৈয়ার করা যাইতে পারে। কার্যের সুবিধার জন্য মণ্ডলীর নায়ক ও উপনায়ক প্রভৃতি কার্যকর্তাগণ শিক্ষকের সম্মতি লইয়া ছেলেরাই নির্বাচন করিবে। নিয়মপালনের ভার ছেলেদেরই হাতে দিতে হইবে। শিক্ষকের কাজ সেখানে শুধু পরামর্শদাতা-রূপে। একান্ত প্রয়োজন না হইলে তিনি মণ্ডলীর কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য যে শিক্ষার গোড়াপত্তন এ কথা ভুলিলে চলিবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রই কোন বিষয়ে সমগ্র জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। কিন্তু যদি সেখানে বিদ্যাশিক্ষার পর তাহার মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগে, উৎসাহ দেখা দেয় এবং যদি জ্ঞানলাভের সাধনগুলি তাহার আয়ত্ত হয়, তবে ভবিষ্যতে নিজের আনন্দে, নিজের চেষ্টাতেই সে জ্ঞান পূর্ণতর করিবে। প্রাথমিক শিক্ষা ছাত্রকে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশাধিকার মাত্র দিতে পারে। আমাদের পরিকল্পিত বিদ্যালয় যদি সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে তাহা হইলেই তাহার কাজ শেষ হইবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব অনেকখানি। কিন্তু যিনি স্বেচ্ছায় সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাকে তাহার গুরুত্ব সম্বন্ধে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

সমাপ্ত

ওরি